International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য পালাটিয়া: সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশন রীতি

পবিত্র রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, আসাম

সার কথা (Abstract)

উত্তরবঙ্গেরএকটি বিশিষ্ট লোকনাট্য হল 'পালাটিয়া' । উত্তরবঙ্গে প্রচলিত কুশান, কিষ্কাবন্দী, বিষহরা প্রভৃতি লোকনাট্যের পরিবেশনের একটি বিশেষ রীতি আছে। এগুলি গীতবহুল; প্রথমে পয়ার-গীতের মাধ্যমে কাহিনির কিছু অংশ বর্ণনা করা হয়, তার পর মূলী ও দোয়ারির কথোপকথনের মাধ্যমে সেই কাহিনি বা ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়, এর পর প্রয়োজন অনুসারে ঘটনাটি অভিনয় করা হয়। এক্ষেত্রে অনেক কথাই বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়, তাই সমস্ত ঘটনা অভিনয়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আলোচ্য 'পালাটিয়া' গানের উপস্থাপন রীতি ভিন্ন প্রকৃতির, সাধারণ যাত্রাপালর মতো। এক্ষেত্রে কাহিনি বর্ণনা নয়, সরাসরি পালা পরিবেশিত হয়,তাই এর নাম পালাটিয়া। এই নাট্য রাজবংশী সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজবংশী ভাষায় অভিনীত হয়। এর আসর (অঙ্গন মঞ্চ /arena stage) পূর্বে বৃত্তাকার থাকলেও পরবর্তীকালে বর্গাকার (square) হয়েছে। আসরের চারিদিক ঘিরে দর্শকেরা বসে। নাট্যকাহিনির সূত্র ধরেই দর্শকদের সঙ্গে পরিবেশনকারীদের (Performer) সংযোগ ঘটে, যা লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট দিক। পৌরাণিক, শাস্ত্রকেন্দ্রিক বা সামাজিক কাহিনি নিয়ে পালাগুলি তৈরি হয়। এগুলোর মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষকে ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষা প্রদান করা হয়। বর্তমানে এই নাট্যধারা হারিয়ে যেতে বসেছে।

সূচক শব্দ(key Words):পাঁচালি, পালাটিয়া, শাস্তরি, গীদাল, দোয়ারী, ওস্তাদ, বরগি, খ্যাপা।

১.০.০ ভূমিকা

উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেবৃহত্তম জনগোষ্ঠীহল রাজবংশী সমাজ। এই জনগোষ্ঠীর ভাষা আর্যমূলীয় হলেও নৃ-গোষ্ঠীও দিক থেকে এরা মঙ্গোলীয়।এই সমাজ বহু প্রাচীন কাল থেকেই তাদের নিজস্ব সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কৃতিকে লালন ও সংরক্ষণ করে আসছে। রাজবংশীরা অনেকটাই রক্ষণশীল হওয়ার জন্য তাদের সংস্কৃতিকে এখনও বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে নিজস্ব জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি আর্য-সংস্কৃতিরও প্রভাব দীর্ঘদিন থেকেই তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এই রাজবংশী সমাজে নানা ধরনের লোকসংগীত, লোকনাট্য প্রচলিত আছে, যেগুলো তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির বাহক। এরকমই একটি বিশিষ্ট লোকনাট্যের রূপ হল 'পালাটিয়া গান'।রাজবংশীরাই এর পৃষ্ঠপোশক। এক সময় জমিদার, জোদ্দার বা সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের উদ্যোগে এই সব পালাগানের আয়োজন করা হত।এই পালাগুলো রাজবংশী ভাষাতে পরিবেশিত হয়।তবে বর্তমানে বাংলা ভাষার প্রভাবে অনেক অঞ্চলে বাংলাতেও উপস্থাপন করতে দেখা যায়।

২.০. গবেষণার বিষয়

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বেশিরভাগ লোকনাট্য লোকসংস্কার বা পূজাপার্বণের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু লোকনাট্য আছে, যেগুলো সরাসরি কোনো পূজাপার্বণ বা লোকসংস্কারের সঙ্গে জড়িত নয়; কেবল বিনোদনের জন্যই উপস্থাপিত হয়। পালাটিয়াগানও সেই ধরনের সংস্কার নিরোপেক্ষ একটি পালানাট্য। এই গান সম্পর্কে অনেকেই নানা দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই গানের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রকারভেদ সম্পর্কে এখনও কেউ সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে আলোকপাত করতে পারেননি। সেই অনালোকিত বিষয়গুলোই হল আমাদের গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

৩.০. উদ্দেশ্য

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত পালাটিয়া গান হল বিশেষ একটি লোকনাট্য-রূপক (form of a folk theater)। এই লোকনাট্যের স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জনসমক্ষে উঠে আশা প্রয়োজন। সেই দিকটিকে মাথায় রেখেই এই বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে। নীচে এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়।

ক) পালাটিয়া গানের স্বরূপ উদ্ঘাটন।
খ) পালাটিয়া গানের প্রকৃতি তথা লৌকিক প্রেক্ষাপট নির্ণয়।
গ) উপস্থাপন রীতি ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সঠিক দিকদর্শন।

৪.০.তথ্যপর্যলোচনা ও গবেষণার শূন্যতা

পালাটিয়া গান নিয়ে এর আগে যে আলোচনা হয়নি এমন নয়, যাঁরাই উত্তরবঙ্গেরলোকনাট্য তথা লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রায় সকলেই কম-বেশি পালাটিয়া গান নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন নির্মলেন্দু ভৌমিকের ‘প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত’ গ্রন্থে পালাটিয়া গানের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। এছাড়া দিলীপ কুমার দের ‘কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি’, দিগ্বিজয় দে সরকারের ‘উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি’ ও ‘কোচবিহারের লোকনাটক’ , শিশির মজুমদারের ‘লোকনাট্য-নাটক-কথা’, সুবোধ সেনের ‘উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন’ প্রভৃতি গ্রন্থে পালাটিয়া গানের আলোচনা আছে । কিন্তু উল্লিখিত এই সব গ্রন্থে প্রায় একই ধরনের আলোচনা পাওয়া যায়, প্রায় সকলেই নির্মলেন্দু ভৌমিকের আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত। তবে অধ্যাপক দীপককুমাররায় তাঁর ‘হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য’ গ্রন্থে পালাটিয়া গানের স্বরূপ ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে প্রথম কিছুটা ভিন্নধর্মী দৃষ্টিতে আলোচনা করেন। বলতে গেলে তাঁর আলোচনাতেই এই লোকনাট্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। এছাড়া আরও অনেকেই উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গেপালাটিয়ারও উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু তার পরেও এ-কথা মানতেই হয় যে, কোনো বিষয়ে একেবারে শেষ কথা কেউই বলতে পারেন না, যদি সেটা লোকসংস্কৃতির মতো চলমান ও নিরন্তর পরিবর্তনশীল বিষয় হয়, তাহলে তো কথায় নেই। তাই পালাটিয়া গান সম্পর্কে যা কিছুই ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, সে-সবই চরম বা শেষ কথা নয়। সেগুলো অধ্যয়ন করে আমাদের মনে হয়েছে যে, সমাজে যেভাবে পালাটিয়া প্রচলিত আছে, তার সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এখনও সঠিক ভাবে উঠে আসেনি। এই পালাগুলোর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কেও কিছুটা ভিন্নভাবে চিন্তা করার অবকাশ আছে। তাছাড়া এর উপস্থাপনরীতি সম্পর্কে এখনও সামগ্রিক বিশ্লেষণ হয়নি বলে আমাদের মনে হয়। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত এই সব শূন্যস্থান কিছুটা পূর্ণ করার চেষ্টাতেই এই ক্ষুদ্র গবেষণার অবতারণা।

৫.০.গবেষণা পদ্ধতি

কোনো সমাজে প্রচলিত বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গেলে, মূল তথ্য সেই সমাজ থেকেই পাওয়া যায়। তাই এই ক্ষুদ্র গবেষণার প্রাথমিক উপাদান বা তথ্য আমরা উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছি। তথ্য সংগ্রহে মূলত সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি(Observation Method) ও বিষয়-অনুধ্যান পদ্ধতি (Case study Method) অনুসরণ করা হয়েছে। যেখানে যেখানে এই গান প্রচলিত আছে, আমরা সেই সমস্ত অঞ্চল যতটা সম্ভব সমীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। গৌণ তথ্য উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, আন্তর্জাল-আর্কাইভ প্রভৃতি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণের জন্য মূলত প্রদর্শন তত্ত্ব বা অভিকরণ তত্ত্বের (Performance Theory) সাহায্য নিয়েছি। এই তত্ত্বের মাধ্যমে পালাটিয়াগানেরউপস্থাপনরীতি, দর্শক-আসন, দর্শকের প্রকৃতি প্রভৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়া সহায়ক হিসাবে প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গবাদ (Contextualism), ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method),প্রভৃতি তত্ত্ব-পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৬.০. পরিভাষা বিচার

'পালাটিয়া' হল পালাবন্দি গান। পালাগান বলতে আমরা বুঝি, যে গানে পালা থাকে ।'পালা' শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় 'টিয়া' যুক্ত হয়ে 'পালাটিয়া' শব্দটি তৈরি হয়েছে। রাজবংশী ভাষায় এরকম 'টিয়া' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ প্রচুর দেখা যায়। যেমন জামটিয়া, একটিয়া, ষোলটিয়া ইত্যাদি । 'টিয়া' প্রত্যয়টি 'যুক্ত' বা 'আবদ্ধ' অর্থে যুক্ত হয়। সুতরাং 'পালাটিয়া' শব্দের অর্থ হল 'পালাযুক্ত' বা 'পালাবদ্ধ'। সুতরাং বলা যায় রাজবংশী ভাষায় পালাবদ্ধ গানকেই পালাটিয়া বলা হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অন্যান্য লোকনাট্যগুলোও তো পালাবদ্ধ, তাহলে একটি বিশেষ শ্রেণির লোকানাট্যকেই কেন পালাটিয়া বলা হচ্ছে? এর উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে যে, কুশান, কিষ্টাবন্দি, সত্যপীর প্রভৃতি গানও পালাযুক্ত, কিন্তু সেগুলোর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাই পালাটিয়া বলা হয় না। যেমন বিষহরা মনসামঙ্গলের পালা অবলম্বনে গীত হয়, 'কুশান' রামায়ণ, 'সত্যপীরের' গানে সত্যপীরের পালা – এরকম বিশেষ বিশেষ কাহিনী অবলম্বনে এক একটি লোকনাট্য গড়ে উঠেছে। এই সব পালারউপস্থাপনরীতিও পালাটিয়ার থেকে আলাদা।মূলী বা গীদাল (গায়েন) ও দোয়ারীর কথোপকথনের মধ্য দিয়েই মূলত পালাকাহিনি পরিবেশিত ও ব্যাখ্যাত হয়। এই দুজন ব্যক্তি কথাসাহিত্যের কথকের ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানের উপন্যাসে যেভাবেলেখন বা কথক কাহিনি বর্ণনা করেন,অনেকটা সেরকম। অভিনয়

এখানে গৌণ। আগে গানের মধ্য দিয়ে কাহিনি বর্ণনা, তার পরে মূলীদোয়ারির কথোপকথন; প্রসঙ্গক্রমে তাঁরাই বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর অভিনয় সংযোজিত হয়েছে।

অপর দিকে পালাটিয়া গানেএরকম কোনো কাহিনি বর্ণনের ব্যাপার নেই। মূলী-দোয়ারিও থাকে না। সরাসরি বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে নাট্য পরিবেশিত হয়। অর্থাৎ একমাত্র পালাটিয়া গানেই কাহিনি বর্ণনা না করে সরাসরি পালা অভিনীত হয়। বিভিন্ন কাহিনি নিয়ে ছোটো ছোটো পালা রচিত হয়, যা এক রাতের মধ্যে (৪/৫ ঘন্টার মধ্যে) অভিনয় করা সম্ভব। এভাবে পালাবদ্ধ গান রচিত ও অভিনীত হয় বলেই এর নাম পালাটিয়া।কুশান, বিষহরা বা কিষ্টাবন্দী গানের পালাও পালাটিয়ার আকারে পরিবেশন করাযেতে পারে। কিন্তু তখন সেগুলো আর ঐসমস্ত বিশিষ্ট নামে অভিহিত হবে না, পালাটিয়া নামেই চিহ্নিত করা হবে।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থে পালাটিয়া গানকে 'পাঁচালী' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের এই গানকে ঠিক পাঁচালী বলা যায় না। কেন না, এই গানগুলো মূলত সামাজিক জীবনকেন্দ্রিক পালা, এর সঙ্গে দৈব-প্রভাব যুক্ত কোনো দেব-দেবীর পূজা-প্রচার বা সে-সম্পর্কিত ক্রিয়া-আচারাদির কোনো অনুসরণ নেই। অনেক সময় পৌরাণিক কাহিনির অনুসরণ দেখা গেলেও সেগুলো পাঁচালীর আকারে উপস্থাপিত নয়। এ-সম্পর্কে ড. দীপক কুমার রায় মহাশয় তাঁর 'হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য' গ্রন্থে বলেছেন, "তবে পাঁচালী ও পালাটিয়া এক নয়। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে প্রচলিত পাঁচালী এবং জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত পালাটিয়া উভয়েই লোকনাট্য হলেও একই ধরনের লোকনাট্য নয়; আঙ্গিক ও পরিবেশন রীতিতে পার্থক্য আছে।"[১]

৭.০.পালাটিয়ার উৎস

পালাটিয়া গানের উৎস সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। ড. দীপককুমার রায় মনে করেন পালাটিয়া গানের মূল উৎস হুলির গান। এ-সম্পর্কে তিনি একটি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন, যথা —

পালাটিয়া হুলির গান
চেংরালারহোলেক মান।[২]
[পালাটিয়া হুলির গান, ছেলেগুলোর হল মান।]

এই প্রবাদ থেকে পালাটিয়াকেই হুলি বলা হচ্ছে, না পালাটিয়া ও হুলি উভয় রীতির গানের কথা বলা হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। উভয় প্রকার গানই পুরুষদের দ্বারা পরিবেশিত হয়। অবশ্য এখন পালাটিয়ায় নারীর ভূমিকায় নারীরাও অভিনয় করছেন। যাই হোক হুলির গান হল কেবল পুরুষ-আচার যুক্ত ছোটো-ছোটো পালা-কেন্দ্রিক গান। এই গান সম্পূর্ণ আদিরস-প্রধান। তাই এর আসরে নারী ও কম বয়সী বাচ্চাদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু অপর দিকে পালাটিয়া গানের প্রধান বিষয় হল ধর্মতত্ত্ব। ধর্ম-পথে মানুষকে চলার উপদেশ দানের মধ্য দিয়ে একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে গান বাঁধা হয়। সম্ভবত এই তত্ত্ব-মূলক পালাগুলিই ছিল প্রাচীন। পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের জীবনকেন্দ্রিক পালা তৈরি হয়।তাছাড়া হুলির গান হল আচার-কেন্দ্রিক গান, দোল-উৎসবের আগের দিন, রাজবংশী সমাজে প্রচলিত 'ভেড়ার ঘর-ছোবা' (বুড়ির ঘর

পোড়ানো) উপলক্ষ্যে এই গান পরিবেশন করা হয়। কিন্তু পালাটিয়া গানের এরকম কোনো উপলক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই।

পালাটিয়া গানের প্রাচীন রীতিতে শাস্ত্র সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক লক্ষণীয় বিষয়। এই ধরনের শাস্ত্রীয় তর্ক রাজবংশী সমাজের খ্যাপাগানে দেখা যায়, যার মূলে আবার রয়েছে তুকথা গান। তুকথার তত্ত্ব নিয়েই দুই খ্যাপার মধ্যে তর্ক হয়। সম্ভবত এই ধরনের তর্ককে কেন্দ্র করে পালাটিয়া গানের সৃষ্টি হতে পারে বলে আমাদের মনে হয়। পরবর্তী আলোচনায় এর সমর্থন পাওয়া যাবে।

৮.০. পালাটিয়ার শ্রেণি-বিভাগ

পালাটিয়া গানের শ্রেণি-বিভাগ নিয়ে বিতর্ক আছে। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই এই গানকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক ও ড. শিশির কুমার মজুমদারের মতে তিন প্রকার পালাটিয়া হল – (১) মান-পাঁচালী, (২) খাস-পাঁচালী ও (৩) রঙ-পাঁচালী। আবার যেহেতু পালাটিয়াকে ঠিক পাঁচালী বলা যায় না, তাই ড. দীপক কুমার রায় কেবল 'পাঁচালী' কথাটির জায়গায় 'পালাটিয়া' শব্দটি যুক্ত করলেন যথা –(১) খাস পালাটিয়া, (২) অং পালাটিয়া (রাজবংশী ভাষায় শব্দের আদি 'র' অনেক সময় 'অ' হয়) ও (৩) মান পালাটিয়া। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, পরিবেশনকারী দলগুলির কেউ কেউপালাটিয়াকে 'পাঁচাল' বা'পাঁচালী' বলেন। তবে পালাটিয়া গানের মূল পীঠস্থান মানিকগঞ্জের মানুষ 'পাঁচালী' বলার পক্ষপাতী নয়। আমরাও 'পালাটিয়া' নামটিই গ্রহণ করছি। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও রাজবংশী সংস্কৃতির ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমাদের মনে হয়েছে যে,'পালাটিয়া'গান মূলত দুই প্রকার। যথা –(১) শাস্তরি ও (২) সামাজিক। উভয় প্রকার পালাটিয়াকেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন শাস্তরি — পৌরাণিক ওতত্ত্বমূলক এবং (২) সামাজিক – খাস-পালাটিয়া ও অং-পালাটিয়া।

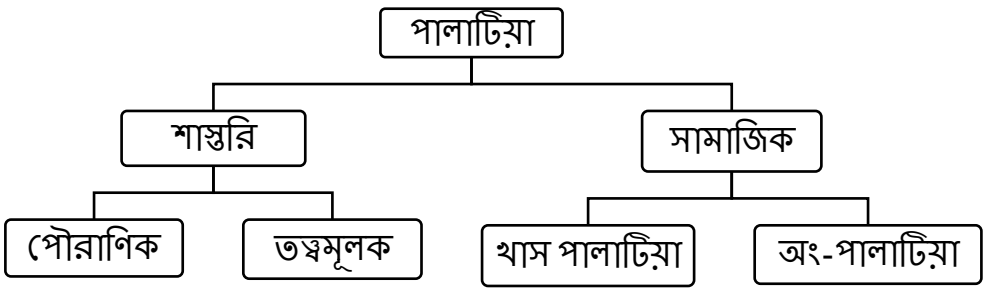

৮.১. শাস্তরি: রাজবংশী ভাষায় কঠিন শব্দকে সরলিকরণ করে উচ্চারণ করার প্রবণতা খুব বেশি। যেমন মন্ত্র>মন্তর, যন্ত্র>যন্তর; তেমনি শাস্ত্র>শাস্তর, তার সঙ্গে '-ই' প্রত্যয় যোগে 'শাস্তরি' শব্দটি তৈরি হয়েছে। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক যাকে মান পালাটিয়া বলেছেন, আমরা তাকেই বলছি শাস্তরি। অবশ্য শাস্তরি নামটি তিনিও উল্লেখ করেছেন। ড. ভৌমিক এই গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন – "শাস্ত্রীয় তর্ক ও আলোচনাই ইহাতে মুখ্য। এই জন্য ইহাকে কখনো-কখনো 'শাস্তরি' গানও বলা হয়। একটি সামাজিক বা পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া দুই পক্ষ বা কাহিনীর নায়ক-নায়িকা একটি বিশেষ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত

করিবার জন্য তর্কালোচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তর্কালোচনাই ইহার মূল বিষয়, কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের মূল্য এখানে তেমন নাই।"[৩]

যদিও এই গান কোনো সংস্কারকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয় না, তবু একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে পালাটিয়া গান পরিবেশন করা হত। বর্তমানে কেবল মানুষের বিনোদনের জন্য এই গান পরিবেশিত হয়।আগের মতো ধামও নেই, আর খরচ বহন করার মতো স্থানীয় জোদ্দারও নেই। তাই বর্তমানে 'দশঙ্গতি' ভাবে অর্থাৎ কোনো কমিটির উদ্যোগে এগুলো আয়োজিত হয়। যাই হোক ড. ভৌমিকের মতানুসারে এর বিষয় মূলত শাস্ত্র আলোচনা হলেও কাহিনির অবলম্বন পৌরাণিক ও সামাজিক হতে পারে। তাই আমরা শাস্তরি পালাটিয়াকে পৌরাণিক ও তত্ত্বমূলক – এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছি।

৮.১.১. পৌরাণিক: শিক্ষামূলক বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে যে পালাটিয়া গান বাঁধা হয়, তাকেই পৌরাণিক পালাটিয়া বলা যায় । যেমন নিমাই সন্ন্যাস, ভক্ত প্রহ্লাদ, দর্পী চাঁদ সদাগর ইত্যাদি। এই সমস্ত পালার মধ্য দিয়ে মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় তর্কের অবকাশ কম। মূল কাহিনির মাধ্যমেই মানুষকে ধর্মীয় নীতি-শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৮.১.২. তত্ত্বমূলক: এই ধরনের পালাটিয়ায়কোনো সামাজিক ঘটনা বা কাহিনিকে অবলম্বন করে শাস্ত্রীয় তর্কালোচনা শুরু হয়। সমাজ-জীবনে ধর্ম তথা শাস্ত্রীয় তত্ত্বকে কীভাবে মেনে চলতে হয়, তাই নিয়েই এই সব কাহিনি তৈরি হয়। এই গানে সাধারণত এক জন গোঁসাই(গুরু) থাকেন । কখনও কখনও দুই গোঁসাই-এর মধ্যেও শাস্ত্রীয় বিষয়ে লড়াই দেখা যায়। এই ধরনের লড়াইকে রাজবংশী ভাষায় 'নড়ক' বলা হয়। এই নড়কে যিনি হেরে যান, তিনি অপর জনকে গুরু বলে স্বীকার করেন। এই ধরনের ঘটনা 'খ্যাপা' গানে লক্ষ করা যায়। খ্যাপা গানের নড়ককে গুরু-শিষ্যের ডারা ও রাধা -কৃষ্ণের ডারা –এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। খ্যাপাগানের মূল ভিত্তি আবার তুকথা গান। তাই মনে হয়, তুকথা বা খ্যাপা গানের সঙ্গে এই পালাটিয়া গানের একটা গভীর সংযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পালাটিয়ায় যিনি গুরু ভূমিকায় অভিনয় করেন, তিনি বাস্তবিক জীবনেখ্যাপাগানেরওগুরু।অথবা তিনি নিজে খ্যাপা না হলেও, তাকে সেসব তত্ত্ব-কথা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। পালা চলা কালীন অনেক মনশিক্ষামূলক তুকথা গানও পরিবেশন করা হয়।

অন্য দিকে এই পালাটিয়ায় আর এক ধরনের কাহিনি লক্ষ করা যায়। সেখানে একজন নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনি গঠিত হয়। সাধারণত সেই নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম বয়সী বিধবা চরিত্র হয়, যার পুনর্বিবাহ সম্ভব। অল্প শাস্ত্র জানা কোনো শিষ্যের সঙ্গে সেই নারীর শাস্ত্রীয় তর্ক শুরু হয়। গানের মূল বিষয় এই তর্কই; কাহিনি এখানে গৌণ। তত্ত্ব-কথা কম জানার জন্য সেই গোঁসাই-শিষ্য বিধবার প্রতি অপমানকর আচরণ করেন। তা নিয়েই মূল বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত সেই নারীর কাছে যুক্তিতে হেরে গিয়ে, তাকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। এই ধরনের দুটি জনপ্রিয় পালা হল 'নয়নশরি ও বৈষ্টম বাউদিয়া' এবং 'জ্ঞানীবালা সাই ও পটপটিয়া গোঁসাই'। এরকম আরও কয়েকটি পালা হল 'প্রেমচাঁদ গোঁসাই-বাংলাদেশি সাই', 'চৈদ্দগোসাই-পেচকেটার সংসার'; 'সাগর গোঁসাই-অথালশরি'; 'সৎগুরু-চোরলক্ষণ'; সুধন্য গোঁসাই ইত্যাদি।

এই সমস্ত পালাটিয়া গানে নারীকে সম্মানপূর্বক উচ্চ আসন দেওয়া হয়। বিশেষ করে সমাজে কম বয়সী বিধবা, যাকে রাজবংশী ভাষায় 'চিটুলবিধুয়া' বলা হয়, তাদের সসম্মানে পুনর্বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায় এই সব পালার মধ্যে। যেমন পটপটিয়াজ্ঞানীবালার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য হন, তেমনি বৈষ্টম বাউদিয়া নয়নশোরিকে এবং সাগর গোসাইঅথালশরিকে বিবাহ করেন।

৮.২. সামাজিক : সামাজিক পালাটিয়া গানে সাধারণ মানুষের জীবনকে চিত্রিত করা হয়। এই ধরনের পালাতে নীতি শিক্ষার ব্যাপার থাকলেও তা প্রধান হয়ে ওঠে না। সামাজিক জীবন-জিজ্ঞাসাই এই পালাটিয়ার মূল উপজীব্য বিষয়। তবে পালায় জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকার-ভেদের জন্য এই পালাটিয়াকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা খাস-পালাটিয়া ও অং বা অং পালাটিয়া।

৮.২.১. খাস-পালাটিয়া: খাস পালাটিয়ার বিষয় হল লোক-জীবনের বিভিন্ন সুখ-দুঃখের ঘটনা । এখানে রাজবংশী তথা গ্রাম্য সমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষেরই জীবন প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রেও নারী-চরিত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক এবং শিশিরকুমার মজুমদার খাস পালাটিয়া বলতে বুঝিয়েছেন সমাজে ঘটে যাওয়া কোনো কলঙ্ক কাহিনির পালাকে । কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে খাস-পালাটিয়ায় আমরা গ্রাম-সমাজের লৌকিক জীবনের প্রাধান্য দেখি। 'খাস' অর্থে লৌকিক বা নিজস্ব বিষয়কে বোঝায়। যে-পালাটিয়ায় সরাসরি লৌকিক জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়, তা-ই খাস-পালাটিয়া; সেখানে কলঙ্ক-কেচ্ছা বড়ো কথা নয়। তাকেই আর-একটু অতিরঞ্জিত করে দেখালেই হয় রং-পালাটিয়া।যাই হোক খাস পালাটিয়ায় রাজবংশী সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম-অন্যায়ের প্রতিফল বা প্রতিকার প্রভৃতি বিষয় পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি পালা হল 'পণ প্রথা অভিশাপ, স্বামী খুনী আসামী বাপ'; 'এই যুগত কায় দামী, টাকা না বিয়ার স্বামী'; 'সেই দিনের শঙ্কনিআজিকার জননী'; 'সুখের সংসারে অশান্তির ঝড়'; 'শ্বশুরে কুটেছে ধান শাশুড়ি ফেলাছেছান, বৌমায়বিছিনাত থাকি শনেছে মোবাইলের গান'; 'কুমারী মায়ের চোখের জল' ইত্যাদি।

৮.২.২. অং বা রং পালাটিয়া: রাজবংশী ভাষায় শব্দের আদিতে 'র' থাকলে প্রায়ই 'অ' হয়ে যায়। যেমন রঙ্গিলা>অঙ্গিলা।অঙেরপালা, অর্থাৎ প্রেমের পালা; কৌতুক-হাস্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত প্রেমের পালাকেই অং-পালাটিয়া বলা হয়। প্রেমের মধ্যে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন আসে। তাকে অতিক্রম করতে গিয়ে নানা-রকম কৌতুকের সৃষ্টি হয়। পালায় কৌতুক-হাস্য সৃষ্টির জন্য একজন ভাঁড় চরিত্র থাকে, তাকে বড়গি বলে। নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি নেই, তিনিই কাহিনিকে গতি দান করেন । জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত এরকম বিখ্যাত একটি পালা হল 'ঢাকোশোরি'। তাছাড়া 'গোলাপিশোরি', 'চিন্তাশোরি', 'পেলান্টিশোরি', নোলোশোরি'অশ্চর্যআজেলা বা কাজলরেখা' ইত্যাদি। এই সমস্ত পালায় বিধবাদের পুনর্বিবাহ, রাজবংশী সমাজের 'ডাঙ্গুয়া' প্রথা প্রভৃতি বিষয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'ডাঙ্গুয়া' রাজবংশী সমাজে প্রচলিত এক প্রকার বিবাহ। রাজবংশী সমাজে এই ধরনের কয়েকটি বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, যেগুলো সমাজের চোখে কিছুটা নিম্ন মানের হলেও সমাজ-স্বীকৃত ছিল।

৯.০. পালাটিয়া গানের উপস্থাপন রীতি

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিষহরা, কুশান, কিষ্ণাবন্দি প্রভৃতি গানে মূল গীদাল ও দোয়ারির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মূল কাহিনি কথিত ও ব্যাখ্যাত হয় আর পালাটিয়া গানে সেরকম কোনো ব্যাপার থাকে না;এক্ষেত্রে সরাসরি নাট্যাভিনয় শুরু হয়। যেহেতু কাহিনি বর্ণনার কোনো ব্যাপার থাকে না, তাই সাধারণত পাত্র-পাত্রীরা আসরে প্রবেশ করে প্রথমে নিজের (নাট্য-চরিত্রের) পরিচয় দিয়ে তার পরে অভিনয় শুরু করেন। যেমন 'চৈদ্দগোঁসাইপেচকেটার সংসার' পালায় পেচকেটাআশরে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলে –

> 'নমস্কার, মোরে নাম পেচকেটা, মোরে বায় দুইটা মাইয়া, কায় জানে বারে দুইটা মাইয়া হলে এত সুখ হয়! আগত জানলে আর একটা বিয়াও করনু হয়।'[৪]

[বঙ্গানুবাদ – নমস্কার আমারই নাম পেচকেটা, আমার (বাবা) দুটো স্ত্রী, কে জানে দুটো বিয়ে করলে কপালে এত সুখ হয়! আগে জানলে আরও একটা বিয়ে করতাম।]

তেমনি ভাবে 'পটপটিয়াগোসাই-জ্ঞানিবালা সাই' পালায় বগুলা গোঁসাই আসরে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন —

> 'যাউক বাবারে, মোরে নামটা বগুলা গোঁসাই। যাউক তোমরাও শুনিলেন মোর নাম বগুলা গোঁসাই। এই দশচক্রভগমান, সগায়একটে হলে ঐটায় কিন্তু বৃন্দাবন।'[৫]

[বঙ্গানুবাদ – যাক বাবা আমারই নাম বগুলা গোঁসাই। যাক আপনারাও শুনলেন আমার নাম বগুলা গোঁসাই। এই দশচক্র ভগবান, সবাই এক জায়গায় হলে সেটাই কিন্তু বৃন্দাবন।]

এই গানের দলের এক জন ম্যানেজার থাকেন। তিনিই দলের দেখা শোনা করেন। তবে যিনি গান বাঁধেন বা পালা রচনা করেন, তাকে বলা হয় ওস্তাদ। পালায় চরিত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংলাপ সব সময় থাকে না। কাহিনি অনুসারে গানগুলো পর পর সাজানো থাকে। সংলাপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসরে মুখে মুখে রচিত হয়। পাত্র-পাত্রীরা অনেক সময় সংলাপ ভুলে গেলে ওস্তাদ তা ধরিয়ে দেন অথবা চরিত্রাভিনেতা নিজেদের মতো করে সংলাপ চালিয়ে নেন। প্রয়োজন অনুসারে কাহিনির প্রসার বা সংকোচন হয়ে থাকে। বর্তমানে অনেকেই এই সব লোকনাট্যের পালা সংকলিত করে গ্রন্থ বের করছেন। কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, এই সব পালা-নাটকের নির্দিষ্ট সংলাপ প্রায় থাকে না। আসর ভেদে এর অনেক রদ-বদল করা হয়।

৯.১. আসর ও দর্শক :পালাটিয়া গানের আসর যেকোনো লোকনাট্যের মতোই হয়। আগে বৃত্তাকার ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে বর্গাকার বা চৌকোণ আসর দেখা যায়। আসরের মাঝখানে বাদ্যযন্ত্রী ও দোয়াররা বসেন। চতুর্দিকে অভিনয় হয়। অন্যান্য লোকনাট্যের মতোই এরও 'বাসাঘরা' (সাজঘর/Greenroom or Dressing Room) থাকে। পাত্র-পাত্রীরা সেখান থেকে এসে অভিনয় করেন। কেবলবাসাঘররারপথটুকু ছেড়ে দিয়ে আসরের চতুর্দিক ঘিরে দর্শকেরা বসে। দর্শক হিসাবেস্থানীয় রাজবংশী সমাজের প্রাধান্য থাকলেওঅন্যান্য সম্প্রদায়েরমানুষও এই গান শুনতে আসে। তবে আসরে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদেরই প্রাধান্য দেখা যায়,যুবসমাজপ্রায় দূরেই থাকে। দর্শক ও অভিনেতা একই সমতলে অবস্থান করে,

তাই উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষব্যবধান থাকে না। প্রয়োজনে উভয় পক্ষে ভাব-বিনিময়েও অসুবিধা হয় না । প্রায় সমস্ত পালাতেই ভিক্ষা করার একটি দৃশ্য থাকে। কোনো নাট্য-চরিত্র ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দর্শককেই গৃহস্থ হিসাবে ধরে নিয়ে ভিক্ষার পাত্র এগিয়ে দেন। দর্শকও যে যা পারে তার হাতে দান করে। এভাবে নাট্য-ঘটনার সঙ্গে দর্শকও যুক্ত হয়ে যায়।

৯.২. বাদ্যযন্ত্র:পালাটিয়া গানে আগে খোল-করতাল, সারিঙ্গা, বাঁশি, ঢোল ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্র ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে যুগের হাওয়ায় অনেক নতুন বাদ্য-যন্ত্রের প্রবেশ ঘটেছে। যেমন তবলা, নাল, হারমোনিয়াম, কর্ণেট, ফ্লুটে ইত্যাদি। পালা শুরু হওয়ার আগে ঐকতান বাদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। কোনো জনপ্রিয় গানের সুর বাজানো হয়, যার মাধ্যমে আসরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৯.৩. গানের অন্তর্বয়ন: পালাটিয়া গানে দীর্ঘ, মাটিয়া সুর ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনে মনোশিক্ষা বা দেহ-তত্ত্বমূলক গানও পরিবেশন করা হয়। বিশেষ করে শাস্তরি গানের সঙ্গে দেহতত্ত্ব-মনশিক্ষা গান গভীর ভাবে যুক্ত। এইসব গানের তাল সাধারণত তেওড়া বা কাহারবা, তবে দাদরা তালের গানও পরিবেশিত হয় । অনেক সময় ছুট বা ফাঁস গানে চটকা তালের গানও উপস্থাপন করা হয় দর্শকদের মনরঞ্জনের জন্য।

প্রথমেমাটিয়া সুরের বন্দনা গান দিয়ে পালা শুরু হয়। বন্দনারওবিভিন্ন ভাগ আছে, খোলা-বন্দনা, আসরবন্দনা, সরস্বতী বন্দনা প্রভৃতি ক্রমানুসারে পরিবেশিত হয়। তার পড় পাত্র-পাত্রী প্রবেশ করেন, দর্শককে নমস্কার করে 'পাট' (অভিনয়) শুরু করেন। বিভিন্ন ঘটনায় সংলাপের কাজ অনেক সময় গানের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। তর্ক বা প্রশ্নও অনেক সময় গানের মধ্য দিয়ে করা হয়। পালাটিয়া গান ভাওয়াইয়া গানের মতো সব ক্ষেত্রে ৫/৬টা স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোনো সময় সপ্তক পার হয়ে উপরের ('তারা'-র) রে পর্যন্ত উন্নীত হয়। বিশেষ করে শাস্তরি গানে । যেহেতু এই গানে মনশিক্ষার প্রভাব বেশি, তাই সেখানে এই ব্যাপারটি বেশি দেখা যায়। আবার উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতে কোমল 'গা'-এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। কিন্তু পালাটিয়া গানেরঅনেক ক্ষেত্রে কোমল 'গা'-এর ব্যবহার দেখা যায়।

৯.৪. পালাটিয়ার নৃত্য: পালাটিয়া গানের নৃত্য-ভঙ্গিগুলি হল ঘুরানি, চলন, ড্যারপেচি ইত্যাদি । বিষহরার নাচ যখন চলনে পরে, তখন তার মধ্যে বিশেষ দোলন দেখা যায়, অনেকটা সাপের চলনের মতো । কিন্তু পালাটিয়ার নাচে সেরকম কোনো ভঙ্গি নেই, তার বদলে ঘুরানি ও 'কমর-ঝোকা' নাচ বেশি দেখা যায়। অবশ্য যখন শুধু মনরঞ্জনের জন্য নৃত্য পরিবেশন করা হয়, তখন নৃত্য-ভঙ্গির কোনো নির্দিষ্টতা থাকে না, সাধারণ নাচই দেখা যায়, যা বিষহরা-দোতরা-চোরচুন্নি নির্বিশেষে প্রায় সব ধরনের লোকনাট্যেই চলে।

১০.০. পালাটিয়ার প্রসার

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, পালাটিয়া জলপাইগুড়ির গান। কিন্তু বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই গান রংপুর, কোচবিহার, দার্জিলিং ও অসমের কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাও, ধুবুরি প্রভৃতি জেলাতেও প্রচলিত থাকার

সন্ধান পাওয়া যায়। অপর দিকে দুই দিনাজপুরে পালাটিয়া অন্যরূপে প্রচলিত, সেখানে 'খন' নামে পরিচিত । শিশির কুমার মজুমদার অবশ্য 'পালাটিয়া' ও 'খন'-কে ভিন্ন-ধর্মী লোকনাট্য বলার পক্ষপাতী । কিন্তু আমাদের মনে হয় দিনাজপুরের 'খন' আর জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের পালাটিয়া একই গোত্রের।

কোকরাঝার জেলার সেরফাংগুড়িতেঅং-পালাটিয়ার কথা পাওয়া যায়, ধুবুরিতেশাস্তরি গানের সন্ধান মেলে। এ-থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমানেঅসমে পালাটিয়া হারিয়ে গেলেও অতীতে প্রচলিত ছিল।অসমেনয়ানশোরি, দুবুলাবালি প্রভৃতি পালার কথা পাওয়া যায়। যাই হোক পালাটিয়ার দল এখন জলপাইগুড়ি জেলাতেও খুব কম দেখা যায়। অসমে তো নেইই, কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি, রানিরহাট, জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি, সাপ্টিবাড়ি, বেলাকোবা, মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু দলের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাণিকগঞ্জেই চলন্ত দলের সংখ্যা সর্বাধিক। সেখানে এখনও ৭/৮টি দল এই পালানাট্য (folk theater) পরিবেশন করে চলছে বলে জানা যায়।

১১. উপসংহার

উপরে পালাটিয়া' গানের নাম-পরিভাষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, অংশগ্রহণকারী সমাজ তথা দর্শকের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল । তার পাশাপাশি উপস্থাপন রীতি, নৃত্য-গীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল।এই পালাগানের উৎস কীভাবে হয়েছে, কীভাবে সময়ের পরিবর্তনে তার বিবর্তন ঘটেছে ইত্যাদি বিষয়ও সংক্ষেপে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে, এই গান প্রত্যক্ষভাবে পূজা-পার্বণ বা সংস্কারকেন্দ্রিক না হলেও এই গানের সঙ্গে রাজবংশী সমাজের ধর্মচেতনা গভীর ভাবে জড়িত হয়ে আছে, যে বিষয়ে এখনও অনুসন্ধানের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এই পালাগানে ব্যবহৃত সংগীতের সুর-সংস্থান, নৃত্যভঙ্গি বিষয়ে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের অবকাশ আছে।

সূত্রনির্দেশ

১. দীপককুমাররায়, হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, কলকাতা, টেরাকোটা, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫৯।
২. তদেব।
৩. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, কলকাতা, অঞ্জলি পাব., ২০১১, পৃষ্ঠ -২২৯।
৪. উপেনন্দ্রনাথ রায়, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার,মাণিকগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, স্থান- তথ্যদাতার বাড়ি, ১২.১১.২০১৫।
৫. পর্যবেক্ষণ - ঝাড়মাগুড়মারি, কালিপূজা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত পালা, ১১.১১. ২০১৫।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ

১. দে, দিলীপ কুমার – কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, অনিমাপ্রকাশনি, জানুয়ারি ২০০৭।
২. দে সরকার, দিগ্বিজয় – উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, পত্রলেখা, ২০০৪।
৩. দে সরকার, দিগ্বিজয় – কোচবিহারের লোকনাটক, কলকাতা, অনিমাপ্রকাশিনী, ১৯৯৭।

৪. বর্মা, সুখবিলাস – জাগ গান, কলকাতা, আর্ট পাবলিশিং, ২য় সং ২০১০।
৫. বর্মা, সুখবিলাস – ভাওয়াইয়া, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ১৯৯৯।
৬. মজুমদার, শিশির – উত্তর গ্রাম চরিত, কলাকাতা, দীপ প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৮।
৭. মজুমদার, শিশির – লোকনাট্য-নাটক-কথা, কলকাতা, দে'জ, ২০০৫।
৮. সেন, সুবোধ – উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২।

তথ্যদাতার তালিকা

১. মাধব মহন্ত, পুরুষ, বয়স- ৬০, পশ্চিম খলিসামারি, পো.- খাপসির ডাঙ্গা, জেলা- আলিপুরদুয়ার, ১৪.১১.২০১৫।
২. জিতেন্দ্রনাথ রায়, পুরুষ, বয়স- ৬৩, গ্রাম- ডাকের কামাত, পো.- মাণিকগঞ্জ, জেলা জলপাইগুড়ি ১২.১১.২০১৫।
৩. ভাউক্সা রায়, পুরুষ, বয়স- ৫০বছর, নিরঞ্জন পাঠ, পো: গোঁসাইরহাট, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ১৪.০৭.২০১৬।
৪. অমল রায়, পুরুষ, বয়স-৫২ বছর, গ্রাম- ঢ্যাংকালী, পো: খট্টিমারি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ১৫.০৭.২০১৬।
৫. চন্দন দাস, পুরুষ, ৬৫, গ্রাম- হারিয়াপাড়, রংধামালি, জলপাইগুড়ি, ১০.১১.২০১৫।
৬. কলীন্দ্র রায় (কলেয়া), পুরুষ, গ্রা- উত্তর খাগরাবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ১৩.১১.২০১৫।
৭. অনন্তকুমার মহন্ত, পুরুষ, গ্রা- উত্তর খাগরাবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ১৩.১১.২০১৫।
৮. উপেনন্দ্রনাথ রায়, পুরুষ, গ্রা- মাণিকগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ১২.১১.২০১৫।